বিজ্ঞানবাদ : পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন

-বিপ্লব

১১/৬/০৫

::

পরীক্ষাকেই একমাত্র প্রামান্য বলে মানা হল। বিজ্ঞানের পৃথিবী এভাবেই চলে। পরীক্ষালব্ধ ফলের গুরুত্ব তত্ত্বের চেয়ে বেশী। তত্ত্ব পরিবর্তনশীল, পরীক্ষালব্ধ ফল নয়। পরীক্ষালব্ধফলই বিজ্ঞান, তত্ত্বসমূহ (theory) বিজ্ঞানের যন্ত্রাংশ মাত্র, পরীক্ষার বিশ্লেষনে ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই জন্য কেও যখন কোরানে বা বেদে বিজ্ঞান পেয়ে থাকে, তাদের জিজ্ঞেস করুন, কোরান বা বেদে পরীক্ষালব্ধ ফল কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে আয়াত বা শ্লোক মিললেই বিজ্ঞান হয় না। গাড়ী আর গাড়ীর যন্ত্রাংশ যেমন এক নয়, তেমন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের তত্ত্বও আলাদা।

::

বিজ্ঞানবাদ ব্যাপারটা পুরানো,কিন্তু কথাটা নতুন। তাই লিখতে বসেছি এর সংজ্ঞা। আসলে বিজ্ঞানবাদ সম্মন্ধে লোকের অনেক ভুল ধারণা। তার অবসান ঘটাতেই এই লেখা।

বিজ্ঞানবাদ মানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হচ্ছে এই রকম : হাইপোথেসিস বা প্রকল্প-পরীক্ষা-পরীক্ষালব্ধ ফল-প্রকল্পের সাথে ফলের পার্থক্য-এবং পার্থক্য থেকে উন্নততর প্রকল্প। এই বৃত্ত অনুসরন করে চিন্তা করা এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়াই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদ।

প্রকল্পের উদাহরন দিচ্ছি।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের কারণ সন্ধানে, বাজার গরম তিন ধরনের প্রকল্পে। কেউ বলছেন, কোরান এবং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে **মূল এবং একমাত্র** কারণ (ভিন্নমত, ফেইথ ফ্রিডম বা ডানিয়েল পাইপ) (১)। আরেকটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হচ্ছে, আমেরিকার কর্পরেট যুদ্ধাস্ত্র এবং তেলের জন্য মধ্যপ্রাচ্য দখলে নেমেছে। তাই সন্ত্রাসবাদীরা আসলেই আমেরিকার তৈরী (সদালাপী কিছু লেখক এবং আমেরিকার মুক্ত রেডিওর বামপন্থী বা ইসলামপন্থী লোকজন)(২)। আবার কেও কেও বলছেন, কোরান এবং আমেরিকা উভয়ই সমান দায়ী (মুক্তমনা)(৩)।

বিজ্ঞানবাদীর মতন চিন্তা করতে গেলে, প্রথমেই ধরতে হবে উপরোক্ত সব দাবীই প্রকল্প মাত্র। এরপর ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসের উপর বিশ্লেষন করে দেখতে হবে এমন কিছু তথ্য কি পাওয়া যাচ্ছে যা উপোরক্ত প্রকল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না? আমি খুব সংক্ষেপে একটা সংশয়-লিষ্ট দিচ্ছিঃ

(১) ঠিক হলে, বুশ ইরান আক্রমন না করে ইরাক আক্রমন করল কেন? সৌদি আরব কেন আক্রমন করল না? ইরাকের বাথ পার্টি, ধর্ম নিরেপেক্ষ পার্টি বলেই খ্যাত।

(২) ঠিক হলে, সব সন্ত্রাসবাদীরা কি করে কোরান ভক্ত ধার্মিক হয়? একটাও ধর্মনিরেপেক্ষ সন্ত্রাসবাদী পাওয়া গেল না কেন? এটা কি করে সম্ভব ৯/১১ এর সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের কারোর দেশেই আমেরিকার সৈন্যরা দখল করে নি? ল্যাটিন আমেরিকায় আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

ছিল কমিনিউস্টদের দারা পরিচালিত এবং সন্ত্রাস ছিল স্থানীয়। এই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের কারণ কি?

(৩) ঠিক হলে , ভারত বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইসলামিক সন্ত্রাসের ব্যাখ্যা কি? এখানে আমেরিকা বা তাদের দালালরা কোথায়? স্বাধীনতার যুদ্ধ? তাহলে তিব্বত কি ভাবে সন্ত্রাসবাদ ছারাই স্বাধীনতার আন্দোলোন চালাচ্ছে?

প্রকল্প, বিরুদ্ধ প্রকল্প (null hypothesis) এবং বিকল্প প্রকল্প (alternative hypothesis), এই তিনের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানই বিজ্ঞানবাদ।

ভুলচিন্তার তথ্যতালিকাঃ

(১) বিজ্ঞানবাদ এক ধরনের মৌলবাদঃ আসলে উলটো। বিজ্ঞানবাদই একমাত্র স্বীকার করে কোন তত্ত্বই সম্পুর্ন না। তাই মানব জ্ঞান অসম্পূর্ণ। পরীক্ষা এবং গবেষনার মাধ্যমে এখানে জ্ঞান-তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে আরো উন্নত করা হয়। গীতা, কোরান, মার্ক্সবাদ বরং বলে তারা অভ্রান্ত! চরম সত্য!

বিজ্ঞানবাদ বলে সে ভ্রান্ত, তাই ভ্রান্তি ঠিক করতে পরীক্ষা দরকার।

(২) বিজ্ঞানবাদ এবং যুক্তিবাদ এক : এটাও ভুল ধারণা। পার্থক্যটা বিশাল। বিজ্ঞান যুক্তিবাদ ব্যবহার করে। যুক্তিবাদ বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি। শুধু যুক্তিবাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দর্শন হয় না। আমি উদাহরন দিয়ে পরে এটা বোঝাচ্ছি।

(৩) বিজ্ঞানবাদ, মানবিকতাবাদকেই ইঙ্গিত করেঃ এটাও ঠিক নয়। মানবিকতাবাদ খুবই অগভীর ভাববাদী দর্শন। বিজ্ঞানবাদের সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়, এই জন্য, যে উভয়েই মানুষের বংশক্রমিক শ্রেষ্ঠ ভাবে বেঁচে থাকাকেই প্রমান্য উদ্দেশ্য বলে মানে। বিজ্ঞানবাদের অনেক সিদ্ধান্তই মানবিকতাবাদ বিরোধী হতে পারে।

(৪) বিজ্ঞানবাদ দিয়ে আধ্যাত্মিকতার মূল প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া যায় নাঃ একদমই ভুল। বিজ্ঞানবাদ দিয়ে এযাবত ধর্মে যত আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠেছে সবকিছুর খুব ভালো উত্তর দেওয়া যায়। যাতে কোরান, গীতা এবং বাইবেলের ঈশ্বর সর্বস্ব ভেজাল নেই। এই প্রবন্ধে কিছু মূল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের আমি উত্তর দেব।

(৫) বিজ্ঞানবাদ দিয়ে মানুষের অবচেতন মন এবং অযৌত্বিক আবেগের ব্যাখ্যা হয় নাঃ প্রেম, রাগ, বিদ্বেশের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে খুব ভালো ভাবেই পাওয়া যায়। সেটাই আধুনিক মনোবিজ্ঞান। সাহিত্যিকরা এই জন্য যুক্তিবাদ থেকে দুরে থাকতে চান। বিজ্ঞানবাদ যুক্তিবাদ না, তাই এই ধরনের ভীতি অমূলক। এখানে মানবমনের একটা (যুক্তিবাদ) নয়, বিচিত্র রঙেরই সন্ধান করা হয়!

(৬) বিজ্ঞানবাদ দিয়ে সমাজ, রাজনীতি এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যা হয় নাঃ এগুলো আসলেই কিছু পাগল ছাগল বা স্বার্থান্বেষী বা ভুয়ো মার্ক্সবাদীদের প্রচার। এই সমস্ত বিষয়ের গবেষনা সর্বদাই বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরন করে হয়। এখানে কল্পনার স্থান নেই। তাই রাম জন্মভূমিকে ইতিহাস বলে চালালেও পৃথিবীর কোথাও এই দাবী স্বীকৃতি পায় নি। কারণ রামেরই ঐতিহাসিক প্রমান নেই, তা রামজন্মভূমি কোথা থেকে আসবে?

(৭) মার্ক্সবাদ বা দ্বান্দিক বস্তুবাদ সত্য কারণ ইহাই আসল বিজ্ঞানবাদঃ মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানবাদের একটি প্রকল্প বা হাইপোথেসিস। সেই ভাবেই প্রগোনীনের সামাজিক সংখ্যাগতিবিজ্ঞান বা ডুরলাফের সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব বা রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জীনের তত্ত্বও নানান প্রকল্পের একটি। বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে কোন প্রকল্পই চরম সত্য হতে পারে না। প্রতিটি প্রকল্প একটি মডেল মাত্র, যার থেকে পরীক্ষালব্ধ ফলের বিশ্লেষন করা যেতে পারে। প্রকল্পটি পরিমানগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির বিচারে এর সত্যতা নির্নয় করা যায় এবং তত্ত্বের সাথে পরীক্ষার ফলের বিচ্যুতি থেকে এই তত্ত্বগুলির আরো ভালো মডেল প্রস্তাব করা যায়। গুনগত (Qualitative) প্রকল্পেরও বিচার করা সম্ভব, তবে তাতে ভেজাল থাকবেই যতক্ষন না সেটাকে এক পরিমানগন (Quantitative) প্রকল্পে রূপান্তরিত করা না যাচ্ছে।

(৮) বিজ্ঞানবাদ আরেক ধরনের ধর্ম!

সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের নানান গবেষনায় এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আমাদের অন্যতম মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি সুস্থ পরিবার তৈরী করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বায়িত্ববান শক্তিশালী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সমাজবিজ্ঞানের গবেষনালব্ধ ফলের ভিত্তিতে একথা নির্বিধায় বলা যায়, ভবিষ্যতের প্রজন্মকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী করা আমাদের মূল সামাজিক কর্তব্য। এখন এটার সাথে ধার্মিক ধারণার মিল থাকতে পারে। তার মানে কি এই, যে বিজ্ঞানবাদ ধর্ম হয়ে গেল? আসলের ধর্মের বিরোধীতা করতে গিয়ে, কেও কেও একটা অধার্মিক অস্তিত্বতাবাদ তৈরী করতে চাইছে, যেখানে ধর্মের বিরোধিতায় তারা নিজের অস্তিত্ব খুঁজছে। বিজ্ঞানবাদে এই ধরনের ধার্মিক বা অধার্মিক অস্তিত্বতার সংকটের কোন মূল্য নেই। প্রতিটি ধারণার পেছনে, গবেষনালব্ধ ফল চাই।

(৯) বিজ্ঞানবাদ মানে বোহেমিয়ান স্বাধীন মুক্ত জীবনের চাবিকাঠি!

সম্পূর্ণ স্বাধীন বা পরম মুক্তজীবন বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। ভ্রুন হিসাবে আমাদের আগমন আকস্মিক বা র‍্যান্ডম বটে, কিন্তু এই যে আমরা লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছি, এবং একটা সুস্থ জীবন যাপন করছি, সেটা র‍্যান্ডম না। এর পেছনে আমাদের বাবা মা এবং সমাজের অবদান আছে। সেটাতো সত্য! স্টুয়ার্ট মিলের লিবার্টির (John

Stuart Mills, On Liberty 1869) বক্তব্য অনুযায়ী, সমাজ থেকে আমরা যা পাই, সেটা না ফিরিয়ে দিলে, সমাজই টেকে না। আর সমাজ না টিকলে, স্বাধীনতা কথাটাই অর্থহীন। অর্থাৎ আমাদের এই মানব জীবন র‍্যান্ডম এবং অর্থহীন ভেবে বেকার বসে থাকলে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। যৌন স্বাধীনতাকে পোস্টমর্ডান দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যেতে পারে (অর্থাৎ স্থান কাল পাত্রের ভেদে, যৌন কাজ সম্পাদনের জন্য মানুষের স্বাধীনতার মাত্রাটাও বিভিন্ন হবে) , কিন্তু মানুষ খুন করার স্বাধীনতাকে, মুক্তমানব জীবনের দাবিপত্রে সামিল করলে , সেটার সমর্থনের কেও গবেষনা করতে রাজী হবে কি না আমার সন্দেহ আছে! সামাজিক, আইনানুগ এবং ব্যক্তিনির্ভর নৈতিকতা সৃস্টির শ্রেষ্ঠ উপায় বিজ্ঞানবাদ এবং এই নিয়ে গবেষনা চলছে।

বিজ্ঞানবাদ বনাম মৌলবাদ, বিজ্ঞানবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

বিজ্ঞানবাদের ইতিহাসই বলে দেবে বিজ্ঞানবাদের সৃষ্টি হয়েছে, পরীক্ষালব্ধ ফলকে মানব জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে। ব্যাপারটা আজ হয়ত সহজ, গ্যালিলিওর সময় অত সহজ ছিল না!

বিজ্ঞানবাদের আদিরূপ হচ্ছে পরীক্ষাভিত্তিক জ্ঞানের (empiricism) সংযোজন। ব্যবলনীয় সভ্যতা থেকে পাওয়া এবের প্যাপিরাস (১৫৫০ খৃঃপঃ) মানব সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ যেখানে চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর নানান পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করা আছে। গ্রীক সভ্যতায় (পঞ্চম খৃঃপুঃ), প্লেটো স্কুলে গনিত এবং জোর্তিবিদ্যা শেখানোর কথা বলেন (*Protagoras)*। তবে দর্শনের শিক্ষার সাথে বস্তু জগতের ঘটনাবলীর যোগসূত্র ছিল ক্ষীন। অর্থাৎ দর্শন ছিল বিমূর্ত। আরিস্টটল এই বিমূর্ত দর্শনে এক মাত্রা জুরলেন-সেটা হল আরোহী সিদ্ধান্তের পদ্ধতি। সিদ্ধান্তের পরীক্ষালব্ধ প্রমান চাই সেটা তিনি শেখান নি। কিন্তু প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষন থেকে, আরোহী সিদ্ধান্তে(deductive) পৌঁছানো আরিস্টটলের কৃতিত্ব।

প্রাচ্যে বৌদ্ধদর্শন প্রথম এই পরীক্ষাভিত্তিক দর্শনের কথা বলে। বুদ্ধকে এক ধর্মপিপাসু মানুষ প্রশ্ন করে, আপনি কি ভগবান কে দেখেছেন? বুদ্ধ উত্তর দেন, তুমি কি দেখেছ? বুদ্ধ বোঝান সেও মানুষ, তিনিও মানুষ। তাই একজন মানুষ ভগবানকে দেখতে পাবে, আর অন্যজন পাবে না, তা হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধের কথা অনুযায়ী যীশুখৃস্ট বা মহম্মদ বা অবতারেরা নিজেদের ঐশ্বরিক বলে যে দাবী করেন তার পরীক্ষালব্ধ প্রমান নেই। তাই বুদ্ধ ঈশ্বর,অবতার বা স্বর্গের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি যে চার মহাসত্য, সেটাও তার সমাজ পর্যবেক্ষনের ফল। উনি সেটাকে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলেই ব্যাখ্যা করেছেন, কোথাও যীশু বা মহম্মদের মতন ঈশ্বর মহাসত্যগুলো কানে কানে ফিসফাস করে বলে গেছেন, এমন দাবী করেন নি।

(যদিও বৌদ্ধধর্মের সবটাই বিজ্ঞানসম্মত না, **গৌতম বুদ্ধকেই আমি বিজ্ঞানবাদের আদিগুরু বলে মনে করি।** আইনস্টাইনও এব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, তাই বৌদ্ধধর্মকেই মানব জাতির ভবিষ্যত বলেছিলেন। আমার পিএচডি থিসিস ও এই জন্য বুদ্ধকে উৎসর্গ করা। তবে জেনবৌদ্ধ ধর্ম ছারা, বাকী বৌদ্ধদর্শন, আর পাঁচটা ধর্মের মতন নিকৃস্ট হয়ে গেছে।)

বুদ্ধের জন্মের পূর্বে, বেদ বা গীতা, সবটাই ছিল ভাববাদী দর্শন, বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়।

রবার্ট গোটেস্কের সুযোগ্য শিষ্য, রজার বেকনের (১৩০০ খৃঃ) হাত ধরেই আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতির শুরু। অবশ্য পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পথিকৃত হচ্ছেন আরব আলকেমিস্টরা এবং গোটেস্কে আরববিজ্ঞানীদের কাজ থেকেই অনুপ্রেরনা পেয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বেকন প্রথম এই প্রকল্প–>পরীক্ষা–>সিদ্ধান্তের চক্রকে বিজ্ঞানের একমাত্র প্রামান্য পদ্ধতি হিসাবে ঘোষনা

করেন (*Novum Organum*,1620)।

"The understanding must not therefore be supplied with wings, but rather hung with weights, to keep it from leaping and flying. Now this has never been done; when it is done, we may entertain better hopes of the sciences."

ফ্রান্সিস বেকন ই প্রথম বললেন একটা দুর্বল প্রকল্প নিয়ে শুরু করলেও, ক্রমাগত পরীক্ষা করে প্রকল্পটি বদলানো যায় এবং ক্রমশ একটি শক্তিশালী প্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।

বেকনের বক্তব্য অনুযায়ী পরীক্ষা শেষে সিদ্ধান্তের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা থেকেই নতুন আরেকটি প্রকল্প বেড়িয়ে আসবে।

"There are and can be only two ways of searching into and discovering truth. The one flies from the senses and particulars to the most general axioms, and from these principles, the truth of which it takes for settled and immovable, proceeds to judgment and to the discovery of middle axioms. And this way is now in fashion."

রেনে ডেকার্টে (১৬১৯), এই বিজ্ঞানবাদকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন (*Rules for the Direction of the Mind*) । ১৬৩৭ সালে প্রকাশিত হল তার চারটি বিখ্যাত স্বতসিদ্ধ (*Discourse on Method*), যা বিজ্ঞানবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

প্রথমঃ শুরুতে কোন তত্ত্বকে কখনোই সত্য বলে মানা যাবে না। সমস্ত তত্ত্বকে আমাদের মনের পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে রাখতে হবে। এটা জরুরী। নইলে, ইসলামিস্টরা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদে নিজের ছেলে মারা গেলেও, কোরানের দোষ দেখতে পাবে না। আবার ক্যাট্রিনাতে যতই লোক মারা যাক, বুশ কিছু লোকের কাছে হিরোই থেকে যাবে!

দ্বিতীয়ঃ জটিল তত্ত্বকে অনেকগুলি সরল তত্ত্বের সমষ্টি হসাবে ভেবে, প্রত্যেকটা সরল তত্ত্বের পরীক্ষা করতে হবে। এতে সমাধান সহজ হয়।

তৃতীয়ঃ পরীক্ষা, প্রকল্প এবং সিদ্ধান্ত সব কিছুর মূলেই যে চিন্তা আছে, সেটা কে সিঁড়ি ভাঙার মতন ভাঙতে হবে। সমান্তরাল নয়, ধারাবাহিক চিন্তাসূত্রে সমাধান করতে হবে।

চতুর্থঃ সিদ্ধান্ত কত শক্তিশালী বা সত্যর কত কাছাকাছি, সেটা নির্ভর করবে, কত নিখুত ভাবে পরীক্ষা পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষন করা হয়েছে।

অর্থাৎ, পরীক্ষাকেই একমাত্র প্রামান্য বলে মানা হল। বিজ্ঞানের পৃথিবী এভাবেই চলে। পরীক্ষালব্ধ ফলের গুরুত্ব তত্ত্বের চেয়ে বেশী। তত্ত্ব পরিবর্তনশীল, পরীক্ষালব্ধ ফল নয়। পরীক্ষালব্ধফলই বিজ্ঞান, তত্ত্বসমূহ (theory) বিজ্ঞানের যন্ত্রাংশ মাত্র, পরীক্ষার বিশ্লেষনে ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই জন্য কেও যখন কোরানে বা বেদে বিজ্ঞান পেয়ে থাকে, তাদের জিজ্ঞেস করুন, কোরান বা বেদে পরীক্ষালব্ধ ফল কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? ঈশ্বর মহম্মদ এবং বেদের ঋষিদের কানে কানে এত কথা বলতে পারল, আর ল্যাবডাটাগুলোর কথা বলতে ভুলে গেল? বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে আয়াত বা শ্লোক মিললেই বিজ্ঞান হয় না। গাড়ী আর গাড়ীর যন্ত্রাংশ যেমন এক নয়, তেমন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের তত্ত্বও আলাদা।

এর পরের ধাপে এলেন গ্যালিলিও এবং নিউটন। গ্যালিলিও পরিমানগত পরীক্ষার জনক। অর্থাৎ

পরীক্ষা করতে গেলে যে রিডিং নিতে হয়, সেটা গ্যালিলিও শুরু করেন। নিউটন প্রিন্সিপিয়াতে এসে,সেটাকে পূর্ণতা দিলেন-চারটি যুক্তিবাদের সূত্র দিয়েঃ

নিউটনের যুক্তিবাদের চার সূত্রঃ

1. *We are to admit no more causes of natural things than such as are both true and sufficient to explain their appearances.*

(প্রকৃতির ঘটনাসমূহের বিশ্লেষনে, এক মাত্র সেইসব স্বতঃসিদ্ধ ই ব্যবহার করা যাবে, সেগুলি সত্য বলে প্রমানিত)

2. *Therefore to the same natural effects we must, as far as possible, assign the same causes.* ((১) মানতে পারলে, এটাও মানতে হয়, প্রতিটি নির্দিস্ট প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পেছনে, নির্দিস্ট কারণ আছে।

3. *The qualities of bodies, which admit neither intension nor remission of degrees, and which are found to belong to all bodies within the reach of our experiments, are to be esteemed the universal qualities of all bodies whatsoever.*

(প্রতিটি বস্তুর ধর্ম , এই মহাবিশ্বের সর্বত্র সমান।)

4. *In experimental philosophy we are to look upon propositions collected by general induction from phænomena as accurately or very nearly true, notwithstanding any contrary hypotheses that may be imagined, till such time as other phænomena occur, by which they may either be made more accurate, or liable to exceptions.*

(এই পরীক্ষানির্ভর দর্শন পরিবর্তনশীল-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে নতুন সিদ্ধান্ত উঠে আসবে, সেগুলিকেও আবার পরীক্ষা করতে হবে। যদি পরীক্ষা থেকে, এমন কিছু বেড়োয়, যা প্রকল্পবিরুদ্ধ, তাহলে আরো পরীক্ষা চালাতে হবে। এই ভাবেই সত্যের অনুসন্ধান চলতে থাকবে।)

প্রকৃতিবিজ্ঞানে নিউটনের এই পদ্ধতি চললেও সমাজবিজ্ঞানে তা অচল। কারণ, সমাজবিজ্ঞানের শাখাসমূহের(রাস্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বা ইতিহাস) মূল ভিত্তি হচ্ছে মানুষ, যার সম্মন্ধে বলা যায় না, সে পৃথিবীর সর্বত্র সব মানুষের ধর্ম সমান (নিউটনের যুক্তিবাদের তৃতীয় সূত্র!)।

সংখ্যাতত্ত্বের উদ্ভবের সাথে সাথে এই সমস্যার সমাধান হল।এর কৃতিত্ব সংখ্যাতত্ত্ববিদ ফিসারের। প্রকল্পকে গনিতের রূপে আনা হল এবং আইনস্টাইন বললেনঃ

a hypothesis is a statement whose *truth* is temporarily assumed, *whose meaning is beyond all doubt*. ...

অর্থাৎ প্রকল্প হচ্ছে সাময়িক সত্য, যার বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক বা সংশয়ের উর্দ্ধে।

প্রকল্প পরীক্ষার ধাপে ধাপে হয়ে থাকে। আমি উদাহরন দিচ্ছি। যারা গবেষনা করছেন, তাদেরকে এই পদ্ধতি সব সময় অনুসরন করতে হয়।

ধরুন একটা প্রকল্প বা বক্তব্য হচ্ছে

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাহীন লোকেরাই কেবল গরীব

প্রকল্প দু ই ধরনের হয়। বিরুদ্ধ প্রকল্প (null hypothesis) এবং বিকল্প প্রক ল্প (alternative hypothesis)।

এখন ভারতে দারিদ্রের সংজ্ঞা হচ্ছে দিনে ১৯৩০ ক্যালোরির খাবার সংগ্রহে অক্ষমতা-অর্থের বিচারে মাসে ৬৭০টাকার কম রোজগার।

তাহলে বিরুদ্ধ প্রকল্প (Ho) এখানে কি হবে?

ভারতের শিক্ষাপ্রাপ্তলোকেরাও গরীব।

অর্থাৎ প্রাথমিকশিক্ষাহীনদের গড় আয় (X1) এবং ভারতীয়দের গড় আয় (X2) সমান (X1-X2=0)।

আর এর বিকল্প প্রকল্প (alternative hypothesis:H1) কি?

ভারতীয়দের গড় আয়, প্রাথমিক শিক্ষাহীনদের গড় আয়ের চেয়ে বেশী (X2>X1)।

এখানেই বিজ্ঞানের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা-এখানে প্রকল্পের বিরুদ্ধের বক্তব্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে এবং এই দ্বন্দের মাধ্যমে প্রকল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এর পরের ধাপ হচ্ছে একটা 'নির্ভরযোগ্যতা' ঠিক করা। অর্থাৎ আমরা ধরেই নিচ্ছি এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ত্রুটি আছে। তাই সাধারণ ৯৫% বা ৯৯% নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে (অর্থাৎ সিদ্ধান্তে ৫% বা ১% ভুল থাকতে পারে), সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষন করা হয়।

এর পরে একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক রাশি ঠিক করতে হবে, যার ওপর পরীক্ষা চলবে। এখানে X1-X2 হচ্ছে সেই রাশি। প্রথমে অনেক প্রাথমিক শিক্ষাহীনদের থেকে তথ্য নিতে হবে এবং তার ভিত্তিতে X1-X2 এর নানান সম্ভবনা দেখা হবে। যেমন আমাদের সমাজে দেখা যায়, কিছু কিছু লোক শিক্ষা ছারাও ব্যবসা করে দু পয়সা করেছে, এবং তাদের উপস্থিতির জন্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষাছারাও সচ্ছলতা দেখা যাবে। এর সম্ভবনা খুব ই কম, এবং সেটাই বার করা হবে। এবং এই বিরুদ্ধ সম্ভাবনার পরিমান থেকেই বোঝা যাবে যে সিদ্ধান্তটি ৯৫%, না ৯৯% ঠিক নাকি ভুল।

বিজ্ঞানবাদ বনাম যুক্তিবাদঃ

সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি এবং পরীক্ষানির্ভর সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবাদের সাথে যুক্তিবাদের পার্থক্য করে দিচ্ছে। যুক্তিবাদের সবচেয়ে দুর্বলতা হল, গোডেলের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ A এবং B থেকে আরোহী সিদ্ধান্তে (deductive logic) C তে আসলে, C তে এমন কিছু থাকবে না, যা A এবং B তে নেই। মানুষ যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই আরোহী সিদ্ধান্তে পাওয়া যায় না। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, যুক্তিবাদ দিয়ে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং নতুন চিন্তার (creative imagination) ব্যাখ্যা মেলে না। গোডেলের উপপাদ্যের কারণে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বা সঙ্গীতসৃস্টির কারণ কোন যুক্তিবাদে পাওয়া যাবে না।

তাহলে বিজ্ঞানবাদে কি ভাবে মানুষের সৃজনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা হয়?

এখানে পরীক্ষা করা হয় আগে, পরে আসে ব্যাখ্যা। অর্থাৎ একজন সঙ্গীতজ্ঞ যখন সৃষ্টি করার সাধনা করছে, তখন তার মস্তিস্কের নানা CT Scan এবং বিকিরন পরীক্ষা হচ্ছে। সেই তথ্য দিয়ে, প্রথমে একটা দুর্বল একটা তত্ত্ব খাঁড়া করা হচ্ছে, আবার সেটার ওপর পরীক্ষা করা হচ্ছে। তার থেকে মোটামুটি এখন জানা গেছে, মানবমস্তিস্কের কোন কোন অংশের সক্রিয়তায় একজন মানুশ সৃজনশীল হয় এবং বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই, এটাও এক অসম্পুর্ন তত্ত্ব(David S Davor, director , Project Mind Foundation).

পার্থক্যটা তাহলে কোথায়?

প্রথমত আরোহী সিদ্ধান্ত যে ১০০% ঠিক সেটা মানা হচ্ছে না এবং পরীক্ষার ফলকেই প্রামান্য ধরা হচ্ছে, প্রাথমিক সিদ্ধান্ত A এবং B কে নয়।

অর্থাৎ যুক্তিবাদের সাথে বিজ্ঞানবাদের এক বিশাল পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে যুক্তিবাদ, প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রামান্য ধরে, বিজ্ঞানবাদের কোন সিদ্ধান্তই প্রামান্য নয়, পরীক্ষালব্ধ ফলই একমাত্র প্রামান্য (standard)।

সেই জন্য যুক্তিবাদ দিয়ে ওসামা বিন লাদেন বা স্টালিনকে মহামানব বানানো যায়। আবার কেও মহাঘাতকও বানাতে পারে। তাই যুক্তিবাদ অনেক ক্ষেত্রেই অকেজো। যুক্তিবাদকে বরং বিজ্ঞানবাদের যন্ত্রাংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

বিজ্ঞানবাদ বনাম মানবিকতাবাদঃ

মানবিকতাবাদের নানান সংজ্ঞা বর্তমান। আমেরিকান মানবিকতা সংস্থার ডিরেক্টর ফ্রেড্রিক এডওয়ার্ডের দেওয়া নানান সংজ্ঞা তুলে দিলাম।

Literary Humanism is a devotion to the humanities or literary culture.

(সাহিত্যিক মানবিকতাবাদ মানে পুরো সাহিত্যকেই বোঝায়)

Renaissance Humanism is the spirit of learning that developed at the end of the middle ages with the revival of classical letters and a renewed confidence in the ability of human beings to determine for themselves truth and falsehood.

(রেনেসাস মানবিকতাবাদ হচ্ছে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে মানবমুখী দর্শন-যা থেকে মানুষ নিজে থেকে বুঝতে পারে, কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক। অর্থাৎ কোরান বা বাইবেল নয়, মানুষই ঠিক করবে, কোনটা ঠিক, বা কোনটা ভুল।)

Cultural Humanism is the rational and empirical tradition that originated largely in ancient Greece and Rome, evolved throughout European history, and now constitutes a basic part of the Western approach to science, political theory, ethics, and law.

(সাংস্কৃতিক মানবিকতাবাদঃ গ্রীক সভ্যতা থেকে শুরু হওয়া ইউরোপের মানবমুখী সভ্যতা, যা ইউরোপের আইন এবং রাস্ট্রনীতির ভিত্তি স্বরূপ)

Philosphical Humanism is any outlook or way of life centered on human need and interest. Sub-categories of this type include Christian Humanism and Modern Humanism.

(মানবিকতাবাদের দর্শন মানে মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দর্শন।)

Christian Humanism is defined by Webster's Third New International Dictionary as "a philosophy advocating the self- fulfillment of man within the framework of Christian principles." This more human-oriented faith is largely a product of the Renaissance and is a part of what made up Renaissance humanism.

(খৃষ্টান মানবিকতাবাদ হচ্ছে খৃষ্ট ধর্মের অনুসরন করে উন্নত (?) তর মানুষ হওয়া। বৌদ্ধমানবিকতাবাদও তাই। আবার গান্ধীমানবিকতাবাদ উভয়কে অনুসরন করে।)

Modern Humanism, also called Naturalistic Humanism, Scientific Humanism, Ethical Humanism and Democratic Humanism is defined by one of its leading proponents, Corliss Lamont, as "a naturalistic philosophy that rejects all supernaturalism and relies primarily upon reason and science, democracy and human compassion." Modern Humanism has a dual origin, both secular and religious, and these constitute its sub-categories.

(আধুনিক মানবিকতাবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান, গনতন্ত্র এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার সমন্বয়ে গঠিত দর্শন।)

Secular Humanism is an outgrowth of 18th century enlightenment rationalism and 19th century freethought. Many secular groups, such as the Council for Democratic and Secular Humanism and the American Rationalist Federation, and many otherwise unaffiliated academic philosophers and scientists, advocate this philosophy.

(ধর্মনিরেপেক্ষ মানবিকতাবাদঃ আধুনিক মানবিকতাদের মতন, শুধু বিজ্ঞানকেই এখানে প্রামান্য মানা হয়)

অর্থাৎ ধর্মনিরেপেক্ষ মানবিকতাবাদ এবং বিজ্ঞানবাদে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদের আরেক নামই হচ্ছে ধর্মনিরেপেক্ষ মানবিকতাবাদ।

সমস্যা হচ্ছে '***আধুনিক মানবিকতাবাদের*** সংজ্ঞা নিয়ে- *বিজ্ঞান, গনতন্ত্র এবং মানবপ্রেমের সমন্বয়ে গঠিত দর্শন।*

সমস্যা হচ্ছেঃ

১. *যদি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং মানবপ্রেম বিরোধী হয়? যেমন ধরুন '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনাদের মানবপ্রেম দেখালে, আজ বাংলাদেরশের কি হত?*

আপনাকে কেও মারতে আসলে, আপনি কি যীশুর মতন তাকে মারতে দেবেন?

২. *যদি গনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক হয় তাহলে কি হবে? আমেরিকার ৭৫% মানুষ চাই স্কুলে ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন পড়ানো হোক। ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন অবৈজ্ঞানিক। তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন পড়বে?*

এইজন্যই আধুনিক মানবিকতাবাদ অচল নয়া পয়সা। ধর্মনিরেপেক্ষ বা বিজ্ঞানভিত্তিক মানবিকতাবাদই (যাকে আমি এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানবাদ বলছি) হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর দর্শন।

বিজ্ঞানবাদ বনাম আধ্যাত্মিকতাবাদঃ

আপনার কোন নিকট আত্মীয়ের একমাত্র পুত্র বা কন্যা বিয়োগ হলে, তাকে কি আপনি মার্ক্সবাদ দিয়ে শান্তনা দেবেন? নাকি গিয়ে বলবেন জন্মটাইতো র‍্যান্ডম, তা বাঁচা মরার মধ্যে আর কি আছে? নাকি যুক্তিবাদীর মতন বলবেন মানুষমাত্রই মরণশীল! সেতো একদিন মরতই। তাই শোকের আর কি আছে?

লোকে আপনাকে আহাম্মক ভাববে বা পেটাবে। এগুলো সবই অগভীর কথাবার্ত্তা। এইজন্যই যুগ যুগান্ত ধরে, মানবজন্মের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তর, ঋষিরা খুঁজছেন। এই মূলপ্রশ্নগুলি হচ্ছেঃ

- **আমি কে?:**
  আমি এক জৈবিক সিস্টেম এবং ভাববাদীমনের (সম্ভবত, জন ইকলেস) সমন্বয়।
  http://www.mukto-mona.com/Articles/biplab_pal/dharma3.pdf

- **আমার সত্ত্বা(self) কি?**

আমার এই জৈবিক সিস্টেম, পরিবেশের সাথে **যে ভাবে সাম্য অবস্থায়** আছে, সেটাই আমার সত্ত্বা। এটা তিন ভাবে হচ্ছে

(১) ইনফর্মেশান বা তথ্য বিনিময় করে (information exchange)
(২) বস্তু বিনিময় করে। অর্থাৎ খাদ্য এবং অক্সিজেন গ্রহন করে এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড, মূত্র এবং বিষ্টা বর্জন করে। আলো বা তাপমাত্রার অনুভবের জন্য, যে বিকিরন আমরা গ্রহন করি সেটাও বস্তুর শক্তিরূপ। ভাইরাসের আক্রমনও বস্তু বিনিময়।
(৩) জেনেটিক কোড বিনিময়। এটাকে আমরা প্রজনন বলি। আমাদের জেনেটিক কোড পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সন্তানের জন্ম দিয়ে।

- **আমার সত্ত্বার স্বাধীন এবং পরাধীন অস্তিত্ব (existence) কি কি?**

(৩) বা জেনেটিক কোড হচ্ছে একমাত্র স্বাধীন অস্তিত্ব। এটাকেই ধর্মে আগে আত্মা বলত, কারণ মানুষের স্বাধীন অনন্ত অস্তিত্বের একটা প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই আত্মার কথা বৌদ্ধ , হিন্দু, ইসলাম সব ধর্ম ই প্রচার করে।

(১) এবং (২), তথ্য এবং বস্তুবিনিময়, পরাধীনসত্ত্বা কারণ, তা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মন নির্ভর।

- **আমার সাথে সৃস্টির (Universal creation) সম্পর্ক কি?**

সৃস্টি শুরু হয়েছে এক মহাবিস্ফোরন থেকে। আবার নতুন কোন পরীক্ষালব্ধ ফল পেলে, এটাও ভাবা যেতে পারে, বিস্ফোরন কখনোই হয় নি। সেখানে আমি এলাম কি ভাবে? উত্তর অবশ্যই ডারউইনের বিবর্তনে পাওয়া যাবে।
http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/ononto_upohar.pdf

- **এই সৃস্টির উদ্দেশ্য কি (objective of creation)?**

এটাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন।মানবজনমের উদ্দেশ্যের উত্তর বিজ্ঞান বলবে, আমাদের জেনেটিক কোড টিকিয়ে রাখা। সেটাই রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জিনের তত্ত্ব। কিন্তু এই বিশ্বজগতের (universe) সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এখনো অজানা। আমরা জানি মহবিশ্ব কিভাবে সৃস্টি হয়েছে এবং এর পরিনতি কি, কিন্তু কেন সৃস্টি হয়েছে সেটা অজ্ঞাত। অনেকে এটাকে র‍্যান্ডম সৃস্টিতত্ত্ব বলেই ভাবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা বলায় ভালো, বিজ্ঞানের এর উত্তর আজ নেই, কিন্তু কাল পাওয়া যাবে। এই সৃস্টি এতই বিশৃঙ্খল, এতে যে কোন সস্ট্রার (ঈশ্বর) হাত নেই, সেটা বলাই বাহুল্য।

- **মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি?**

এর একটা উত্তর রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জিনের তত্ত্বে পাওয়া যাবে। যদিও এটাকে স্বার্থপর জিনের তত্ত্ব বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু কোন মাইক্রোথিওরী নয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতন ম্যাক্রো। কারণ কোন অনুজৈবিক প্রমান ডকিনস দিতে পারেন নি, যেটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে, জীবজগতে প্রাণীদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে, মানবজীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যায় একটা অনুজৈবিক প্রকল্প। কি বলছেন ডকিনস?

We are survival machines--robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment. Though I have known it for years, I never seem to get fully used to it. On of my hopes is that I may have some success in astonishing others. --

অর্থাৎ আমরা সবাই একটা সংগ্রামী জেবিক সিস্টেম- যেখানে আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের জেনেটিক কোডকে বাঁচিয়ে রাখা। সন্তান-সন্ততি সৃস্টি করা এবং তাদের শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, যাতে তারা এই বংশগতির বাহক জিনকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

বলা বাহুল্য, জিনের কাজ হচ্ছে দেহের প্রোটিনের গঠনের ফর্মুলাটা মনে রাখা,এবং মানবদেহে যখন নানান প্রোটিন সংশ্লেষন হয়, তখন এই ফর্মুলাটা ধার দেওয়া (?) ! এখন প্রোটিন সংশ্লেষনের সাথে মানবমনে কি ভাবে এই জিন-সংগ্রামী মেশিনের তত্ত্বটা পৌঁছায়, সেটা গাঁজাখুরি না সত্য, সেটা জানতে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

- **মুক্তি (freedom/liberation) এবং বন্ধন (bondage) : এর দ্বৈতসত্ত্বার (dualism) ব্যাখ্যা কি?**

প্রত্যেকটা মূহুর্তে আমার মন মুক্তির সন্ধান করছে। পিঁপড়ে ধরতে যান, সেও প্রথমে পালানোর চেষ্টা করবে!

এই বন্ধন বা মুক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কি?

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেম, প্রকৃতির সাথে একটা সাম্য অবস্থায় আছে এবং পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এটি সুস্থির সাম্য। অর্থাৎ সাম্যবিন্দু থেকে সরে গেলে, আপনাকে আবার সাম্য অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। নইলে আমাদের এই জৈবিক মেশিন বা সিস্টেম কাজ করবে না।

উদাহরন দিচ্ছি।
আমরা খিদে থেকে মুক্তি চাই কখন? যখন খিদে পায়। আবার প্রচুর খেয়ে ফেললে, ভালো খাবার দেখে বমি পায়। তখন মনে হয় খাদ্য থেকে মুক্তি চাই !

অর্থাৎ সাম্যঅবস্থা থেকে সরে আসলে, সাম্য অবস্থার দিকে ফিরে আসাই হচ্ছে একই সাথে বন্ধন এবং মুক্তি। এই জন্য বন্ধন এবং মুক্তি আসলে একিই মুদ্রার উভয়দিক।

আরো উদাহরন দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে অতিরিক্ত সেক্স করার পর, মনে এবং দেহে প্রচুর অবসাদ আসে এবং তখন মনে হয়, এই যৌনতা থেকে সাময়িক মুক্তি চাই। আবার কিছু সময় যাওয়ার পর, দেহ যখন সাম্য অবস্থায় ফিরে আসে, প্রথমে সেক্সের প্রতি একটা নির্মোহ (করলেও হল, না করলেও হল) ভাব জাগে। পরে আরো কিছু সময় অতিবাহিত করলে, যৌন ইচ্ছা বা যৌনতার প্রতি দৃঢ় আকর্ষন জাগে, সঙ্গম অপরিহার্য্য বলে মনে হয়।

বিজ্ঞানবাদ এবং মানবমনঃ

মানুষের নানান আবেগের পেছনে রয়েছে হর্মোনের ভূমিকা এবং মানুষের মস্তিস্কের বিভিন্ন স্থলে এর উৎপত্তি । এরজন্য CT Scan,SPECT, ইত্যাদি উন্নতমানের ইমেজিং এবং মানুষের মাথা থেকে বেড়োনো আল্ফা, বেটা, গামা ইত্যাদি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রশ্মির বিশ্লেষন থেকে প্রেম,ঘৃনা,রাগ ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং এই নিয়ে মনোবিজ্ঞানের বিপুল গবেষনা চলছে। এ ব্যাপারে ডঃ আন্ডি ক্যাডলারের বক্তব্য তুলে দিলাম (2005, **Fear and Loathing in the Human Brain,** http://www.open2.net/humanmind/article_faces.htm)

Research addressing the brain regions involved in human emotion has expanded rapidly in recent years. This is, in part, due to the widening availability of new brain imaging technology, but also to a newfound interest in the idea that certain individual emotions may be served by separate brain systems. This latter theoretical position is at the heart of the idea that selected sets of so-called "basic" emotions with strong evolutionary histories constitute the foundations of human emotion. Although this concept has its origins in the

work of Charles Darwin, it only really took off following the work of psychologists such as Silvan Tomkins, Paul Ekman, and Carol Izard in the 1960s and 70s. Prior to this, emotion research was dominated by the idea that all emotions were coded as values on a limited number of dimensions or scales coding more general emotional constructs, such as valence (how positive or negative an emotion is) and arousal (whether the emotion is associated with low arousal or high arousal). Similarly, early neurological accounts of emotion processing took a similar all-encompassing approach in which all emotions were processed by a circuit of interconnected brain structures known as the limbic system.

Two important findings of Ekman and his contemporaries that changed theories of emotion were studies demonstrating that certain emotions (happiness, sadness, anger, fear, and disgust) were associated with distinct facial signals, and that these were common to cultures throughout the world; observations that now constitute two of the defining features of basic emotions. A third posited feature was the idea that each basic emotion should be associated with a distinct (neuro)physiological signature, such as a particular brain circuit or a more peripheral body state response, including heart rate, or galvanic skin response (an index of lying in the famous lie detector test) and so on. Human evidence consistent with this third feature proved difficult to find; However, support was found in non-human biological studies by researchers such as Joe LeDoux and Jaak Panksepp.

It is of considerable interest, then, that work with humans over the last eight years has begun to identify that certain emotions may be coded by partially distinct brain systems as Ekman and his colleagues had predicted. This research has been aided greatly by recent advances in brain imaging technology that allows more precise localisation of the regions damaged in brain-injured patients, and identification of the areas of the brain that are activated in healthy individuals when they perform a psychological task. A large number of these studies have addressed the areas of our brain that are used to recognise emotion in others; in other words brain systems involved in recognising facial and vocal signals of emotion. Two emotions that have received considerable amount of attention are fear and disgust.

এর মানে এই নয়, বিজ্ঞান মানুষের মনের সমস্ত কিছু জেনে ফেলেছে। শুধু মানুষের মন কেন, বাকী অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের জন্যও এ কথা সত্য। এই অপূর্ণতাকে আরো পরীক্ষা করে প্রায়-পূর্ণ করায় হচ্ছে বিজ্ঞানবাদ। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা মানব মনের যে বিশ্লেষন করেন, সেটাও বিজ্ঞানবাদ। ডস্টভয়েস্কির অযৌত্বিকতাবাদকে বিজ্ঞানবাদের প্রকল্প হিসাবে ভাবা যেতে পারে।

বিজ্ঞানবাদ মানুষের মনের যৌত্বিকতাএবং অযৌত্বিকতা উভয়কেই প্রকল্প হিসাবে গ্রহন করে! এই জন ই বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দর্শন!

তাই আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের, বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে আলার্জি কাটাতে অনুরোধ করি।

বিজ্ঞানবাদ, রাজনীতি, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানঃ

রাস্ট্রনীতি, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত শাখাসমূহের গবেষনা বিজ্ঞানবাদের পদ্ধতি মেনেই হয়। আগে রাস্ট্রনীতি বা ইতিহাসে বিজ্ঞানের পদ্ধতির এতো গুরুত্ব ছিল না। আরোহী সিদ্ধান্তেই বা যুক্তিবাদেই অধিকাংশ গবেষনা হত। কিন্তু বর্তমানে, সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি রাস্ট্রনীতি এবং ইতিহাসের গবেষনাতে প্রবল ভাবে ঢুকে পড়েছে। সংশয়বিহীন ভাবেই বলা যায়, ইতিহাস বলতে গল্প বলা আর রাস্ট্রনীতি বলতে আরোহী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গবেষনা বর্তমানে হালে পানি পাচ্ছে না এবং মানবজ্ঞানের এই সমস্ত শাখাসমূহ বিজ্ঞানবাদকেই প্রমান্য মানছে।

এই জন্য অতীতের ইতিহাস গবেষনায় সাটেলাইট ইমেজ প্রসেসিং থেকে, কঙ্গালের C T Scan , DNA print, Y mutation tracing, ইত্যাদি অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

http://www.shodalap.com/BP_aryan_invasion.htm

বিজ্ঞানবাদ কিভাবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে,সেটা প্রিয়া জোশীর বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যাক (Quantitative Method, Literary History:p263)

Amassing statistics is sometimes regarded in the academy as viewing Internet pornography has been in this prurient age: an indulgence than can only be permitted—and enjoyed—in solitude. Robert Darnton's essay, "Book Production in British India, 1850-1900," takes the particular indulgence of some book historians and makes it thoroughly enjoyable, widely beyond the preoccupations of the initiate. Not only is his attempt to document the proliferation of print in India in the second half of the nineteenth century a major archival achievement; the account of vistas opened by quantitative methods is a particularly inspiring one. Darnton is right early in the essay to caution the use of statistics; he is equally right, however, to charge ahead as he does. As he notes, [However flawed or distorted, the statistics provided enough material for book historians to construct a general picture of literary culture, something comparable to the early maps of the New World, which showed the contours of the continents, even though they did not correspond very well to the actual landscape"

The analogy with maps is a cogent one and made advisedly: quantitative methods expand literary history and make all sorts of discoveries possible, much the way that early maps did in the dissemination of knowledge about "new" worlds. Statistics, like maps, are indeed lies to some extent, but—to borrow Claire Connolly's keen formulation—they are the lies that tell a truth that would not otherwise be evident. One can only hope that literary studies, which has for so long regarded quantitative analysis with suspicion bordering on contempt, will come to be persuaded by Darnton's evidence that quantitative data allow a general picture of a literary culture to emerge that might otherwise be obscured by more conventional qualitative methods of textual analysis."

গত দুই দশকে, বিজ্ঞানবাদ রাস্ট্রবিজ্ঞানের গবেষনাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ব্যপারটি নতুন এবং এ ব্যাপারে আমি জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের, রাস্ট্রনীতির গবেষনার ওয়েপ পেজ থেকে বক্তব্য তুলে দিচ্ছিঃ

http://www.gwu.edu/~psc/methods.shtml

The subfield of quantitative political methodology is relatively new but growing rapidly, influencing the quality of empirical research in every substantive field of the discipline, and making important methodological contributions that transcend disciplinary boundaries. Our methods faculty are actively involved in these exciting developments, publishing in first rate journals in a variety of fields both within and beyond political science, offering widely used public domain statistical software tools, and winning a Gosnell Prize for the best work in political methodology.

বিজ্ঞানবাদ বনাম মার্ক্সবাদঃ

অনেকের ধারণা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদই আসল বিজ্ঞানবাদ। কারণ দ্বান্দিক বস্তুবাদ, বস্তুবাদী সমাজের বিজ্ঞান। আসলে এভাবে ব্যাপারটাকে ভাবা ঠিক নয়। আমরা দেখেছি, আরোহী সিদ্ধান্তমূলক গবেষনা বিজ্ঞানস্বীকৃত নয়। মার্ক্সের সব লেখাই কিন্তু আরোহী সিদ্ধান্তের (deductive logic) পথ অনুসরন করে।

মার্ক্স সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ইতিহাস বিশ্লেষন করে এবং সেটা ছিল গুনগত বিশ্লেষন। এই অর্থে মার্ক্স বিজ্ঞানের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরন করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে পরিমানগত সমাজবিজ্ঞানে (Quatitative Social Science) সেটা গুরুত্বহীন।

বরং মার্ক্সমাদকে সমাজবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই শতাব্দীতে আরো দুই শক্তিশালী প্রকল্প হচ্ছে ইলা প্রিগোনিনের, সামাজিক তাপগতিবিজ্ঞান (Social Thermodynamics) এবং সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব (Social Field Theory) । অক্সফোর্ডের জীব-স ংখ্যাতাত্বি বিজ্ঞানী কফম্যান, এর প্রবক্তা (1993,S.Kauffman, Origin of order, self organization and selection in evolution. Oxford University press) । পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন MIT র ডুরল্যাফ এবং ইয়াং (2001, Social Dynamics), বাওলস (2002, Economic Institution and behavior, an evolutionary approach to micro-economics) এবং এগারভ (2002, An Agglomeration Model).

ইনাদের মতে শুধু দ্বান্দিক বস্তুবাদ বা অর্থনীতি বা মনোবিজ্ঞান বা রাজনীতি দিয়ে সমাজিক বিবর্তন বোঝার চেস্টা করা আসলে নিউটনীয় গতিসূত্রদিয়ে পদার্থের ধর্ম বোঝার চেস্টা করা -যা সম্ভব নয়। কারণ পদার্থের মধ্যে আছে কোটি কোটি অনু-তাদের মধ্যে কি আকর্ষন বিকর্ষন, তা নিউটন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু তাদের সামগ্রিক ধর্ম —যেমন তারা কৃস্টাল হবে না তরল হবে, তা বোঝার জন্য পদার্থ বিদ্যায় সংখ্যাতাত্ত্বিক গতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক

গতিবিজ্ঞানের একটি মূল ধারণা হচ্ছে, একটি অনু কি ভাবে ঘুরে বেড়াবে তা নির্ভরশীল বাকী অনুরা তার উপর গড় যে আকর্ষন বিকর্ষন বল দিচ্ছে তার উপর। অর্থাৎ, একটি মানুষের সমাজিক গতিবিধি সেই সমাজের বাকী মানুষেরা তার সাথে কি কি ভাবে মেলা মেশা করছে -এটা অর্থনৈতিকও হতে পারে, মনস্তত্ত্বও হতে পারে। যেমন ব্যাপারীর সাথে সম্পর্ক ব্যবসার-প্রেমিকার সাথে প্রেমের!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে দ্বান্দিক বস্তুবাদের মুল বক্তব্যের সাথে সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব বা সামাজিক তাপগতিবিজ্ঞানের বিরোধ নেই। কিন্তু, পার্থক্য হচ্ছে, সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং সামাজিক তাপগতিবিজ্ঞান গনিতিক প্রকল্প এবং এদের উদ্ভব হয়েছে পদার্থবিদ্যার ধারণা থেকে, দ্বান্দিক বস্তুবাদ থেকে নয়। তাছারা দ্বান্দিক বস্তুবাদ গনিতিক মডেল নয় বলে এতে ভেজাল ঢোকানোর সুযোগ বেশী।

আরো সহজ ভাবে বললে, সামাজিক বিবর্তনের উন্নতমানের গনিতিক মডেলের জন্য দ্বান্দিকবস্তুবাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক মডেল থেকেই সমাজবিজ্ঞানের নিত্য নতুন মডেল বেরোচ্ছে।

যাইহোক কোন সামজিক গবেষনায় কেও মার্ক্সীয় প্রকল্প ব্যবহার করতেই পারেন। তবে সেটাকে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

বিজ্ঞানবাদ কি আরেক ধরনের ধর্ম ? বিজ্ঞানবাদ মানে কি স্বাধীন মুক্ত বোহেমিয়ান জীবনের চাবিকাঠি?

অনেকেই প্রশ্ন করেন রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জীনের তত্ত্ব মানতে, গেলে, ব্যাপারটা কেমন ধার্মিক ধার্মিক হয়ে যায়। সেইতো সন্তান লালন-পালন। তারজন্য পরিবার প্রতিপালন! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই হিন্দু আর ইসলাম ধর্মের ব্যাপার চলে আসছে না?

এখানে আমার প্রশ্ন হল ধর্মের বিরোধিতা করা আমাদের জীবনের অন্তিম এবং পরম উদ্দেশ্য নাকি?

সমাজ এবং মনোবিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষনা বলছে, শক্তিশালী পরিবার গঠনই সমাজ এবং আমাদের ভবিষ্যত। ধর্মের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কথা বলবো আর নিজের জীবনের উদ্দেশ্যগঠনে বিজ্ঞান মানব না, সেটা কেও বলতেই পারেন। তবে দ্বিচারিতা হয়ে যায়।

বাবা মায়ের মনমালিন্য এবং ডিভোর্স কি ভাবে সন্তানদের প্রভাবিত করে, সে ব্যাপারে রচেস্টার ইনস্টিটিউটের সমাজবিজ্ঞানী ইরিনা সোকোলভের বক্তব্য তুলে দিলামঃ(Depression in Children: What Causes It and How We Can Help)

Certain types of family organizations are closely related to the development and maintenance of symptoms in children. According to family systems theory, when the

married couple has conflict and can not solve it in a constructive way, they are likely to involve their children in the conflict to release some anxiety and tension between them (Wang & Crane, 2001). Child is physiologically vulnerable to everything going on between his parents. Tension and conflict in the family induces emotional arousal in the child, triggering physiological and psychological responses (Wang & Crane, 2001). The results of the study conducted in investigation of the relationship between parents' marital stability, triangulation and the level of depression in children showed that children of marital dissatisfied fathers were more likely to have depressive symptoms than those of dissatisfied mothers. When fathers felt unstable in the marriage and, experienced triangulation in their families at the same time, their children were likely to have depressive symptoms. When fathers felt stable but unsatisfied in their marriage, their children were also more prone to develop depressive symptoms. The finding that the mothers' scores do not affect children as the fathers' do was consistent with the results found in that other studies comparing fathers' and mother's influences on children (Wang & Crane, 2001). It may be explained by the roles in the family in bringing up children and taking care of the family financially, and by the difference of gender in solving a marital conflict. Mothers are often thought of as primary care-takers of the family, fathers are the providers. It is quite common to believe that mothers are more emotionally involved with their children and more emotionally available to them. They consciously separate their roles as mothers and wives, and therefore the independence between roles takes place. When men feel dissatisfied and unstable in their marriage, they may concentrate their energy on the outside of their family, on their friends and society and abandon their role as providers. There is evidence that intense marital conflict is related to a husband's withdrawal during conflict interaction (Wang & Crane, 2001). When man withdraws from a unstable marriage, he withdraws from the mother and the child at the same time, his role as a father is greatly affected by the level of marital satisfaction. Men are also more likely to express an unusual overt behavior such as being aggressive, angry, argumentative, unaffectionate and withdrawn. Women on the other hand, will tend to be more internally hurt, more likely to have depression. Thus, for a child it is easier to identify their father's over behavior and be disturbed by it, rather that their mothers depressive symptoms, such as being sad and crying. When mothers experience marital instability, they become more involved with their children than previously (Wang & Crane, 2001).

অর্থাৎ নিজের জীবনে বিজ্ঞানবাদ মানতে গেলে, সন্তানদের মানুষ করা প্রাথমিক এবং প্রধান কর্তব্য। শুধু তাই নয়, সন্তান ধারণের পর, ডিভোর্স কোন মতেই কাম্য নয়। সন্তান না থাকলে অবশ্য একটা লোক কটা ডিভোর্স করছে, তাতে কিছু যায় আসে না।

পরম স্বাধীনতা বলতে কিছু হয় না। সমাজ থেকেই আমরা বড় হয়েছি, খাচ্ছি পড়ছি। সুতরাং সমাজের যেটা প্রাপ্য, সেটা ফেরত দেওয়ার পরই আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ভাবতে পারি। ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমানা আছে, এব্যাপারে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদি অকৃত্রিম গুরু জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য তুলে দিচ্ছিঃ

WHAT, then, is the rightful limit to the sovereignty of the individual over himself? Where does the authority of society begin? How much of human life should be assigned to individuality, and how much to society? Each will receive its proper share, if each has that which more particularly concerns it. To individuality should belong the part of life in

which it is chiefly the individual that is interested; to society, the part which chiefly interests society.Though society is not founded on a contract, and though no good purpose is answered by inventing a contract in order to deduce social obligations from it, every one who receives the protection of society owes a return for the benefit, and the fact of living in society renders it indispensable that each should be bound to observe a certain line of conduct towards the rest. This conduct consists first, in not injuring the interests of one another; or rather certain interests, which, either by express legal provision or by tacit understanding, ought to be considered as rights; and secondly, in each person's bearing his share (to be fixed on some equitable principle) of the labours and sacrifices incurred for defending the society or its members from injury and molestation.

John Stuart Mill , On Libery (1869)

উপসংহারঃ

বিজ্ঞানবাদ কথাটাতে অনেকের আপত্তি আছে। কারণ মার্ক্সবাদের অত্যাচারে গত শতাব্দীতে ১০ কোটি লোকের প্রাণ গেছে। ঘরপোড়া গরু হলে যা হয়!

কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে কি দেখি? ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষার একটা সংঘ না হলে, কোন দর্শন টেকে না। তাছারা আড্ডা মারা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য, মৌলবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই। দুনিয়াতে যখন মৌলবাদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন বিজ্ঞানবাদ কথাটা তুলে দিলেই হল। মৌলবাদের সংগঠিক শক্তির বিরুদ্ধে এই ভাবে অপিনিয়ান পাস করে লড়া যায় না। চাই গনতান্ত্রিক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গে কি করে বিরোধী শক্তি গত ত্রিশ বছর ধরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন? কারণ বিরোধীদের কোন রাজনৈতিক দর্শন নেই। নানা মুনির নানা মত। নানান দল। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এভাবে কি লড়াই সম্ভব?

চাই শক্তিশালী দর্শন। সেটা একমাত্র বিজ্ঞানেই পাওয়া সম্ভব।